Vol. 51 | No. 3 | 2014

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আড়ালের অপরাজিতা : 'তোমার বীণা নিত্য বাজে'

Volume	51
Issue	3
Year	2014
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	তারেক রেজা
Published online	June 1, 2014
DOI	10.62328/sp.v51i3.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v51i3.6
Pages	১০৭-১২২
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাংলা বিভাগ ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আড়ালের অপরাজিতা : 'তোমার বীণা নিত্য বাজে'

Check for updates

তারেক রেজা*

বাংলা ছোটগল্পের গতি, গভীরতা কিংবা গন্তব্যের দিকে দৃষ্টি দিলে পাঠকের প্রাণে যে প্রশান্তির স্পর্শ লাগে, তাতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) অবদান বিশেষ এবং ব্যক্তিত্বচিহ্নিত — এই উক্তির সত্যতা বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। এ-যুগে রবীন্দ্রনাথে নিবেদিত পাঠকের কাছেও বোধকরি এ-মন্তব্য ক্লান্তিকর মনে হবে। ছোটগল্প বিষয়ক যে-কোনো আলোচনায় গুরুদেবকে প্রণামী প্রদানের সংস্কৃতি যেন নিয়তি-নির্ধারিত। তাঁর চোখে ছোটগল্প যে মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছে, সেই মূর্তিই প্রতিভাবান শিল্পসমালোচকবৃন্দের বিবেচনাকে যুগ যুগ ধরে শাসন করে আসছে। শিল্পবোদ্ধা হিসেবে নিজেদের মুখ রক্ষার প্রয়োজনে রবীন্দ্র-গল্পের দেবীকে ভিন্নতর আচ্ছাদন প্রদানের প্রয়াস নিশ্চয়ই অনুপস্থিত নয়, কিন্তু *সোনার তরী*র 'বর্ষাযাপন' কবিতায় কলকাতা শহরের তেতালার 'ছাতে'র কাঠের কুঠুরির এক ধারে দাঁড়িয়ে দক্ষিণের বায়ু-স্নাত প্রথম প্রভাতের রবীন্দ্রানুভবই তো এখনো আমাদের প্রধান অবলম্বন। তাই 'ছোটো প্রাণ, ছোটো ব্যথা, ছোটো ছোটো দুঃখকথা' এখনো ছোটগল্পের অন্তর ও অবয়ব উন্মোচনে অপরিহার্য মনে হয়, যদিও অনেক মহাপ্রাণের বিশাল বেদনাও তাঁর গল্পের দর্পণে প্রতিবিম্বিত। 'নিতান্ত সহজ সরল' অনুভবকে ধারণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েও গল্পকার রবীন্দ্রনাথ অনেক কঠিন ও জটিল বিষয়ে মনোনিবেশ করেছেন। প্রাত্যহিক জীবনের বিস্মৃতির ভাণ্ডার বিশাল হলেও তা থেকে তিনি নির্বাচন করতে চেয়েছেন 'দু-চারিটি অশ্রুজল'। ঘটা করে তিনি ঘটনার আদি-অন্ত উপস্থাপন করেন নি ঠিকই, কিন্তু বর্ণনার ছটা তাতে নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যাবে। তত্ত্ব ও উপদেশ বর্জনের পরামর্শ তো তাঁর গল্পেই বহুল পরিমাণে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। পূর্বোক্ত প্রস্তাবনা থেকে সরে গিয়ে এ-জাতীয় আত্ম-অতিক্রমণের বিস্তর নজির রেখে গেছেন তিনি। রবীন্দ্র-বিবেচনার বাঁক-বদলের বিস্তারিত আলোচনা বর্তমান নিবন্ধের মৌল উদ্দেশ্য নয়। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের একটি বিশেষ চরিত্রকে লেখকের সাহিত্যভাবনার প্রতিনিধি হিসেবে পাঠ করা সম্ভব কি-না — এই নিবন্ধে তা-ই অনুসন্ধানের চেষ্টা থাকবে।

দুই

রবীন্দ্রনাথের 'জয়পরাজয়' গল্পের রাজনন্দিনী অপরাজিতা পিতা উদয়নারায়ণের সভাকবি শেখরের জন্য অন্তঃপুরে বসে অশ্রু বিসর্জন দিয়েছিল কি-না, সে খবর এই গল্পের পাঠক হিসেবে আমাদের অজানা, কিন্তু ধারণা করি, এই গল্পে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যতত্ত্ব কিংবা সাহিত্যভাবনার একটি বিশেষ দিকে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণের প্রয়াস পেয়েছেন। ছোটগল্পের কাছে পাঠকের যা প্রত্যাশিত তার অনেক কিছুই এই গল্পে উপস্থিত। যে তত্ত্বের দিকে আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত হতে চাচ্ছে তা এই গল্পের রসাস্বাদনের প্রতিবন্ধক নিশ্চয়ই

---

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

নয়, তবু মহাকবির হাতে এই গল্প ধারণ করেছে কবিতার বহুতলবিস্তারি অনুভবপুঞ্জ। *গল্পগুচ্ছে* রবীন্দ্রনাথের কবিত্বকে সমালোচকবৃন্দ প্রশংসার চোখেই দেখেছেন। বুদ্ধদেব বসু (১৯৫৯) দেখিয়েছেন, গল্পগুচ্ছে পাঠকের চিরচেনা জগতের প্রতিভাস সত্ত্বেও তাতে নতুন অভিজ্ঞতায় সিক্ত হওয়ার সুযোগ অবারিত। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের পৌনঃপুনিক পাঠেও আস্বাদনের অভিনবত্ব অব্যাহত থাকার মৌল কারণ, বুদ্ধদেবের বিবেচনায়, কাব্যধর্মিতা, যা তাঁর চোখে বিশ্বসাহিত্যের প্রেক্ষাপটেই ব্যতিক্রম হিসেবে ধরা দিয়েছে। অশ্রুকুমার শিকদার মন্তব্য করেছেন, "গল্পগুচ্ছের' গল্পগুলির মধ্যে নিহিত আছে কবিতা, গীতিকবিতার মূর্ছনা আছে এবং সেখানেই তাদের চিরন্তনতার উৎস।" — (১৯৮১ : ৮৫)। প্রমথনাথ বিশীও লক্ষ করেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প যুগপৎ কবি ও কাহিনীকারের জোড়কলমে রচিত।' (১৩৬১ : ৩০)। রথীন্দ্রনাথ রায় (১৯৫৯ : ১৩১) যখন 'সংহতি', 'স্বল্পভাষী ব্যঞ্জনা' এবং 'অন্তহীন জিজ্ঞাসা ও অতৃপ্ত পিপাসা'কে ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করেন, তখন ছোটগল্পকে কবিতার নিকটতম প্রতিবেশী ভাবতে ইচ্ছে করে। তাই রবীন্দ্রনাথের গল্পবিচারে কবিতার তুলাদণ্ডও কখনো কখনো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। 'কাব্যের একটা গুণ এই যে, কবির সৃজনশক্তি পাঠকের সৃজনশক্তি উদ্রেক করিয়া দেয়; তখন স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে কেহ বা সৌন্দর্য, কেহ বা নীতি, কেহ বা তত্ত্ব সৃজন করিতে থাকেন।' — 'কচদেবযানীসংবাদ' কবিতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের (২০০৬ : ১ম খণ্ড/৯৬৩) এই বিবেচনা অবলম্বনে আমরা 'জয়পরাজয়' গল্পের পাঠনির্মাণে অবতীর্ণ হতে চাই। এই প্রয়াসে রবীন্দ্রনাথের রচনাবলিই হবে প্রধান অবলম্বন। 'আমাদের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের মূল্য-নিরূপণ গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার চেয়েও হাস্যকর।' — সুধীন্দ্রনাথ দত্তের (১৯৯৫ : ২৭১) এই সতর্কবাণী মনে রেখেই 'হাল বাংলার সিদ্ধিদাতা গণেশ' রবীন্দ্রনাথের গল্পের গভীরে প্রবেশের চেষ্টা করা হবে, 'রবীন্দ্রনাথের মূল্য-নিরূপণ' এই রচনার উদ্দিষ্ট নয়।

ফলের শস্যের চেয়ে 'আঁঠি'র গুরুত্ব যাদের কাছে অধিক, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তারা রসজ্ঞ ব্যক্তি নন। কিন্তু ফলের যে-কোন অংশের দিকে ভোক্তার গভীরতর মনোযোগ নিষ্ফল নয় বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। তাই তাঁর কাব্য-বিচারের বহুমাত্রিক অভিব্যক্তি কিংবা এ-প্রসঙ্গে তাঁর সিদ্ধান্ত আলোচ্য গল্পের গূঢ়রহস্য তদন্তে শক্তি সঞ্চার করবে আশা করি :

> অনেকে বলেন, আঁঠিই ফলের প্রধান অংশ, এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তির দ্বারা তাহার প্রমাণ করাও যায়। কিন্তু তথাপি অনেক রসজ্ঞ ব্যক্তি ফলের শস্যটি খাইয়া তাহার আঁঠি ফেলিয়া দেন। তেমনি কোনো কাব্যের মধ্যে যদি বা কোন বিশেষ শিক্ষা থাকে তথাপি কাব্যরসজ্ঞ ব্যক্তি তাহার রসপূর্ণ কাব্যাংশটুকু লইয়া শিক্ষাংশটুকু ফেলিয়া দিলে কেহ তাঁহাকে দোষ দিতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা আগ্রহসহকারে কেবল ঐ শিক্ষাংশটুকুই বাহির করিতে চাহেন আশীর্বাদ করি তাঁহারাও সফল হউন এবং সুখে থাকুন। (রবীন্দ্রনাথ, ২০০৬ : ১ম খণ্ড/৯৬৩)

সুখের প্রত্যাশায় যারা প্রেম-সমুদ্রে অবগাহন করতে চায়, তাদের কাছে সুখ আমৃত্যু অধরাই থেকে যায় — রবীন্দ্রনাথের গান পাঠক-শ্রোতাকে প্রতিনিয়ত এই কথা মনে করিয়ে দেয়। জীবনের মায়ার ছলনাকে প্রত্যাখ্যান করে তাই কখনো কখনো 'আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা'কে স্বাগত জানাতে ইচ্ছে করে। তাই সাফল্য ও সুখের রাবীন্দ্রিক আশীর্বচন ব্যর্থ হলেও দুঃখ নেই। গল্পের গভীর থেকে স্রষ্টার সাহিত্যচিন্তার স্বরূপ অনুধাবনের এই প্রয়াসে

জয় ও পরাজয়ের দুটি পথ হয়ত একই সমান্তরালে প্রসারিত। এই দুইয়ের মধ্যে 'বন্ধনহীন গ্রন্থি' রচনার অভিব্যক্তিই বর্তমান আলোচনার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে।

তিন

যে গল্পের কাঁধে হেলান দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যভাবনায় ডুব দিতে চাই, সেই গল্পের নায়িকার নামকরণের মধ্যেই প্রকৃত কবির পরাভবহীন প্রতিপত্তি প্রকাশ পেয়েছে। গল্পে দুই কবি — শেখর ও পুণ্ডরীককে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতে দেখলেও লেখকের পক্ষপাত পুরোপুরি শেখরের শিরোভাগেই বর্ষিত হয়েছে। সাহিত্যের আসরে রাজা উদয়নারায়ণ প্রকৃত পাঠক কিংবা শ্রোতার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। তাঁকে বসানো হয়েছে বিচারকের আসনে। রাজনন্দিনী অপরাজিতার দাসী মঞ্জরী এই গল্পের প্রারম্ভে কিঞ্চিৎ রস পরিবেশন করেই অপহৃত হয়েছেন। যার হাত দিয়ে লেখক বিজয়ী কবির গলায় জয়মাল্য পরাবেন, তারও কোনো সুস্পষ্ট অবয়ব এই গল্পে অনুপস্থিত। তবু এই অপরাজিতাই আলোচ্য গল্পের ভূমিকে উর্বরতা দিয়েছে, যেখানে জন্ম নিয়েছে কালজয়ী কবিতা ও গান এবং তারই দর্পণে ধরা পড়েছে মহৎ সাহিত্যের কতিপয় তাৎপর্যপূর্ণ প্রবণতা ।

সাহিত্যে যে জীবনের রূপায়ণ প্রত্যাশিত, তা পুরোটাই অপ্রতিহত বাস্তবে আচ্ছাদিত হলে তাতে জীবনের একটা দিক হয়ত উন্মোচিত হয়, কিন্তু যে রূপ ও ঐশ্বর্যের অভিব্যক্তি জীবনকে সুন্দর-মধুর-মনোহর করে তোলে, তার প্রচ্ছায়া তাতে ধরা পড়ে না। 'ভালো মন্দ যাহাই আসুক সত্যেরে লও সহজে' — এই বহুল উদ্ধৃত উক্তির সারবত্তা বিষয়ে কোনো প্রশ্ন না তুলেও বলা যায়, মিথ্যেকে ছুটি দিলে সত্যের পাঠশালায় প্রবেশের পথও রুদ্ধ হয়ে যায়। 'জয়পরাজয়ে'র মঞ্জরীকে নিয়ে হাসি-তামাশা-আমোদ-উপহাসের যে পরিচয় লেখক দিয়েছেন তা কাব্যিক ও কৌতূহলোদ্দীপক, কিন্তু তারই আশ্রয়ে এই গল্পের লেখক এক ভিন্নতর জীবনার্থে অবতীর্ণ হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বলছেন :

> এমনি করিয়া সত্য মিথ্যায় মিশাইয়া মানুষের জীবন একরকম করিয়া কাটিয়া যায় — খানিকটা বিধাতা গড়েন, খানিকটা আপনি গড়ে, খানিকটা পাঁচজনে গড়িয়া দেয়। জীবনটা একটা পাঁচমিশালি রকমের জোড়াতাড়া — প্রকৃত এবং অপ্রকৃত, কাল্পনিক এবং বাস্তবিক। (রবীন্দ্রনাথ, ২০০৬ : ৯ম খণ্ড/৩৫০)

উপরিউক্ত উদ্ধৃতির 'জীবনে'র সঙ্গে 'সাহিত্যে'র আত্মীয়তা প্রগাঢ় বলেই মনে হয়। সাহিত্যেও স্রষ্টার অভিপ্রায়ের সঙ্গে বিচিত্র রুচির পাঠকের আন্তঃসম্পর্কের স্বরূপ নির্মিত হতে দেখা যায় এবং তাতে ভাব ও অভিব্যক্তির বর্ণিল উপস্থাপনার মাধ্যমে শিল্পের সৌরভ ও সমৃদ্ধি অর্জনের প্রয়াসও উপস্থিত। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মে জীবন ও সাহিত্যের সম্পর্ক একজন সমালোচক চিহ্নিত করেছেন এইভাবে :

> রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বে জীবন সাহিত্যের আদর্শ ব'লে স্বীকৃতি পেয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, সে-আদর্শ বস্তুত সাহিত্যের বহির্ভূত নয়, সাহিত্যের অনাত্মীয় নয়, এমন-কি মূলত পৃথকও নয়। দুই মানব-সৃজিত। একই সৃজনশীলতা উভয়ক্ষেত্রে সমভাবে ক্রিয়াশীল। তুলনায় বরং সাহিত্যের মধ্যেই মানুষের আত্মকর্তৃত্ব

> অধিকতর পরিস্ফুট, কেননা সাহিত্যেই কল্পনা সম্পূর্ণ বাধাহীন, এইখানেই 'প্রয়োজন' সম্পূর্ণ পরাহত। (সত্যেন্দ্রনাথ ১৯৯০ : ১৯৫)

জীবনের যে 'পাঁচমিশালি জোড়াতাড়া'র কথা ব্যক্ত করেছেন রবীন্দ্রনাথ, তার সংযোগবিন্দুগুলো ভালোবাসার স্পর্শেই মসৃণতা লাভ করে। জীবনের সাহিত্যিক রূপায়ণে এই ভালোবাসার প্রভুত্বই প্রশ্রয় পেয়ে থাকে। 'প্রকৃত এবং অপ্রকৃত, কাল্পনিক এবং বাস্তবিক' যে জীবন আমরা যাপন করি, তার সবটুকু হয়তো সাহিত্যের দর্পণে ধরা পড়ে না, কিন্তু ধরার অদম্য ইচ্ছেই একজন শিল্পীকে ভবিষ্যতের দিকে টেনে নিয়ে যায়।

জীবনের রূপায়ণ এই গল্পের লক্ষ্য নয়, সাহিত্যের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুসন্ধান উপলক্ষেই রবীন্দ্রনাথ জীবনকে নানাভাবে নেড়েচেড়ে দেখতে চেয়েছেন — এই গল্পের নিবিড় পাঠে এ-রকম একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব নয়। জীবন ও সাহিত্যের মাঝখানে কোনো অপ্রতিরোধ্য দেয়াল রচনার প্রয়াস স্বাস্থ্যকর নয় বলেই মনে করতেন রবীন্দ্রনাথ। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে বস্তুবিশ্বের প্রভাব ব্যাপক বলেই রবীন্দ্রনাথ বস্তুজগতের সঙ্গে হৃদয়ের যোগাযোগকে গভীর তাৎপর্যে উপস্থাপন করেছেন। রবীন্দ্রবিশ্বের বৈষয়িক পরিমণ্ডল পরিক্রমণ শেষে সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত লিখেছেন, 'বস্তুজগতের মধ্যে মানুষের হৃদয় যে ভাব মুদ্রিত করিয়া দেয় এবং বস্তুজগৎ মানুষের হৃদয়ে যে প্রভাব বিস্তার করে তাহাই সাহিত্যের বিষয়বস্তু।' (১৪০৪ : ৩৩৬)। জীবন ও সাহিত্যের মধ্যে সেতু নির্মাণের প্রয়াসই আমাদের বর্তমান বিবেচনা ও বিতর্ককে চালিত করবে।

'জয়পরাজয়' গল্পে সাহিত্যের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত। জীবনের দর্পণে সাহিত্য নয়, বরং সাহিত্যের দর্পণে জীবনকে দেখার অভিপ্রায়ই এই গল্পের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করেছে — একথা নিশ্চিত করেই বলা যায়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, কবিতার যুদ্ধে ঢাকঢোল পিটিয়েই শেখরের পক্ষ নিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। শেখর রাজকবি এবং রাজাকে কবিতা শোনানোর চেয়ে অন্তরালবর্তী রাজনন্দিনীর দিকেই তাঁর মনোযোগ অধিক। গল্পের শুরুতেই লেখক তাঁর পাঠককে জানিয়ে দিচ্ছেন, শেখর 'কোন কোন দিন কাব্য রচনা করিয়া সভাতলে বসিয়া রাজাকে শুনাইতেন সে কণ্ঠস্বর ঠিক এতটা উচ্চ করিয়া পড়িতেন যাহাতে তাহা সেই সমুচ্চ গৃহের উপরিতলের বাতায়নবর্তিনী অদৃশ্য শ্রোতৃমণ্ডলীর কর্ণপথে প্রবেশ করিতে পারে।' (রবীন্দ্রনাথ, ২০০৬ : ৯ম খণ্ড/৩৪৯)। এই বাক্যে 'শ্রোতৃমণ্ডলী' শব্দবন্ধ বহুলোকের অস্তিত্ব-নির্দেশক হলেও, লেখক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে অনুপ্রাণিত করেন যে, অপরাজিতার অন্তরে একটি ব্যক্তিগত মহল নির্মাণের ইচ্ছেই শেখরের মধ্যে প্রবলভাবে সক্রিয় থেকেছে। মানুষ সম্মিলিত প্রয়াসে যে অসম্পূর্ণ জীবনের নির্মাতা, সেখানে শেখর 'যে গানগুলি গাহিতেন তাহাই সত্য এবং সম্পূর্ণ' বলে মত দিয়েছেন লেখক। এই গানে শ্রোতার মন কখনো আনন্দে পল্লবিত, আবার কখনো বিষাদে ভারাক্রান্ত হয়। এই বিষাদের সব পথও শেষ পর্যন্ত আনন্দের নয়নে এসেই মিলে যেতে চায়। সাহিত্যের উদ্দেশ্য বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'আনন্দই তাহার আদি মধ্য অন্ত। আনন্দই তাহার কারণ, এবং আনন্দই তাহার উদ্দেশ্য।' (২০০৬ : ১৭শ খণ্ড/২৭৬)। 'জয়পরাজয়ে'র শেখরের গানে মানবমানবীর চিরন্তন অভিব্যক্তি সুপ্রকাশিত। তাতে 'অনাদি দুঃখ এবং অনন্ত সুখ' খুঁজে পাওয়ার আনন্দ ধরা পড়েছে বলে উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর সাহিত্যতত্ত্ব-সম্পর্কিত

বিভিন্ন গ্রন্থ — বিশেষ করে *সাহিত্য* (১৯০৭), *সাহিত্যের পথে* (১৯৩৬) এবং *সাহিত্যের স্বরূপ* (১৯৪৩) গ্রন্থত্রয় — অবলম্বন করে একজন সমালোচক দেখিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ 'রস অর্থাৎ আনন্দময় হৃদয়ভাবকেই সাহিত্যের অবলম্বন ও উদ্দেশ্য বলে মনে করেছিলেন।' (সুমিতা, ২০১০ : ২৩)। শেখরের গানও রস ও আনন্দ সঞ্চারের মাধ্যমে সর্বস্তরের শ্রোতার চিত্ত জয় করে নিয়েছে। আলোচ্য গল্পের ঘটনাপ্রবাহ যেহেতু আধুনিক কালের নয়, তাই এ-গল্পের নায়কের মানবিক প্রেম সাহিত্যের যুগধর্ম অনুসারে রাধাকৃষ্ণ অবলম্বনেই প্রসারিত হয়েছে :

> গানের বিষয় সেই রাধা এবং কৃষ্ণ — সেই চিরন্তন নর নারী, সেই অনাদি দুঃখ এবং অনন্ত সুখ। সেই গানেই তাঁহার যথার্থ নিজের কথা ছিল এবং সেই গানের যাথার্থ্য অমরাপুরের রাজা হইতে দীনদুঃখী প্রজা পর্যন্ত সকলেই আপনার হৃদয়ে পরীক্ষা করিয়াছিল। তাঁহার গান সকলেরই মুখে। জ্যোৎস্না উঠিলেই, একটু দখিনা বাতাসের আভাস দিলেই অমনি দেশের মানুষ চতুর্দিকে কত কানন, কত পথ, কত নৌকা, কত বাতায়ন, কত প্রাঙ্গণ হইতে তাঁহার রচিত গান উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত — তাঁহার খ্যাতির সীমা ছিল না। (রবীন্দ্রনাথ, ২০০৬ : ৯ম খণ্ড/৩৫০)

অর্থাৎ লেখক জানিয়ে দিচ্ছেন, সর্বমানবের আনন্দ-বেদনার সঙ্গে একাত্ম হতে পারলেই একজন শিল্পস্রষ্টা 'অমরাপুরের রাজা হইতে দীনদুঃখী প্রজা পর্যন্ত' নিজেকে ছড়িয়ে দিতে পারেন। কালজয়ী সাহিত্যস্রষ্টার প্রতিভূ হিসেবেই যেন লেখক শেখরকে আমাদের সামনে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছেন। পরবর্তী পর্যায়ে যা-কিছু ঘটবে, শেখর যে-সকল পরীক্ষার মুখোমুখি হবেন, তা হয়ত রবীন্দ্রনাথের বিবেচনার সারবত্তা প্রমাণেরই সাড়ম্বর আয়োজন। লক্ষ করা যাবে, দাক্ষিণাত্যের 'দিগ্‌বিজয়ী কবি শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে' উদয়নারায়ণকে স্তুতিবাক্যে সিক্ত করে রাজসভায় দাঁড়াবেন যে পুণ্ডরীক, তাঁর নায়কোচিত কর্মকাণ্ডের বর্ণনায় লেখক নিরপেক্ষ থাকেন নি। পুণ্ডরীকের শক্তির দম্ভ সুপ্রকাশিত, কিন্তু সেই শক্তি প্রকাশের ভাঁজে ভাঁজে রবীন্দ্রনাথ ঢেলে দিয়েছেন অনায়কসুলভ কতিপয় প্রবণতা, যার প্রভাবে পাঠকের বিবেচনাও পক্ষপাতশূন্য থাকে না।

রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদপুষ্ট শেখর যেখানে বিনয়ের অবতার, পুণ্ডরীক সেখানে শুরু থেকেই 'যুদ্ধং দেহি'। কবির লড়াই কোন্ উপায়ে সম্পন্ন হবে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই শেখরের। তিনি প্রশান্তির পূজারি। তাঁর কবিতা-গান মানবমনের বিচিত্র বেদনাকেও সুখকর তাৎপর্যে উদ্ভাসিত করতে চায়। তবু রাজার মান রক্ষার প্রয়োজনে তাঁকে শব্দযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে। 'পুণ্ডরীকের বলিষ্ঠ দেহ, সুতীক্ষ্ণ বক্র নাসা এবং দর্পোদ্ধত উন্নত মস্তক' শেখরের রাতের ঘুম কেড়ে নিলেও তিনি জানেন, তাঁর কর্ম অনিবার্যভাবেই কর্তার ইচ্ছেয় পরিচালিত হবে। দুই কবির স্বভাবের স্বরূপ তাঁদের শুভেচ্ছা বিনিময়ের ধরন থেকেই বুঝে নেয়া যাবে : 'কবি শেখর বহুকষ্টে মুখে সহাস্য প্রফুল্লতার আয়োজন করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী কবি পুণ্ডরীককে নমস্কার করিলেন; পুণ্ডরীক প্রচণ্ড অবহেলাভরে নিতান্ত ইঙ্গিতমাত্রে নমস্কার ফিরাইয়া দিলেন এবং নিজের অনুবর্তী ভক্তবৃন্দের দিকে চাহিয়া হাসিলেন।' (রবীন্দ্রনাথ, ২০০৬ : ৯ম খণ্ড/৩৫১)। সন্ত্রস্ত শেখরের শক্তির উৎস যে অন্তরালবর্তী অপরাজিতা, সেই রমণী রবীন্দ্রনাথের মানসসুন্দরীর কথা মনে করিয়ে দেয়। শেখর বলছেন : "আমার যদি

আজ জয় হয় তবে, হে দেবী, হে অপরাজিতা, তাহাতে তোমারই নামের সার্থকতা হইবে।' পুণ্ডরীক 'কত কৌশল, কত কারুকার্য, উদয়নারায়ণ নামের কতরূপ ব্যাখ্যা, রাজার নামাক্ষরের কত দিক হইতে কতপ্রকার বিন্যাস, কত ছন্দ কত যমক।' — সবিস্তারে উপস্থাপন করলেন। পুণ্ডরীকের কুশলী বয়ানে বিপুল উপস্থিতির তুমুল করতালিতে মঞ্চ মুখরিত হলো। সভা নিস্তব্ধ হলে শেখর উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর দৃষ্টি 'সকরুণ সংকোচপূর্ণ'। রবীন্দ্রনাথ শেখরের অবস্থা চিত্রণের জন্য সীতার দ্বিতীয় অগ্নি-পরীক্ষার শরণ নিয়েছেন : 'রাম যখন লোকরঞ্জনার্থে দ্বিতীয়বার অগ্নি-পরীক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন তখন সীতা যেন এইরূপভাবে চাহিয়া এমনি করিয়া তাঁহার স্বামীর সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন।' (রবীন্দ্রনাথ, ২০০৬ : ৯ম খণ্ড/৩৫১)। দুই কবির দেহ-মনের অবস্থা পরিষ্কার করার জন্য রবীন্দ্রনাথ পুণ্ডরীককে বাঘ এবং শেখরকে 'ব্যাধবেষ্টিত হরিণের' উপমায় উপস্থাপন করেছেন। শেখর সবিনয়ে উদয়নারায়ণের পূর্বপুরুষের গৌরবগাথা উপস্থাপন করলেন এবং সেই গৌরবের উত্তরাধিকারী হিসেবে বর্তমান রাজার প্রতিও প্রণতি জানালেন। তাঁর বক্তব্য দীর্ঘ কিন্তু শেষ বাক্যটির দিকেই অধিকতর মনোযোগ দেওয়া যাক : 'মহারাজ, বাক্যেতে হার মানিতে পারি, কিন্তু ভক্তিতে কে হারাইবে।' এই শেষ বাক্যে ভর দিয়েই পুণ্ডরীকের যাত্রা শুরু। কাব্যের চেয়ে কিছুই যে শ্রেষ্ঠ নয়, তা প্রমাণের জন্য দাক্ষিণাত্যের কবির বিচিত্র আয়োজন রবীন্দ্রনাথ বিস্তারিত তুলে ধরেছেন। বক্তব্যের সারবত্তা প্রমাণের জন্য পুণ্ডরীককে 'বেদ বেদান্ত আগম নিগম' হাতড়ে বেড়াতে দেখা যায়। লেখকের ভাষায় পুণ্ডরীকের অভিব্যক্তি :

> বাক্যই সত্য, বাক্যই ব্রহ্ম। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বাক্যের বশ, অতএব বাক্য তাঁহাদের অপেক্ষা বড়ো। ব্রহ্মা চারি মুখে বাক্যকে শেষ করিতে পারিতেছেন না; পঞ্চানন পাঁচ মুখে বাক্যের অন্ত না পাইয়া অবশেষে নীরবে ধ্যান পরায়ণ হইয়া বাক্য খুঁজিতেছেন।
> এমনি করিয়া পাণ্ডিত্যের উপর পাণ্ডিত্য এবং শাস্ত্রের উপর শাস্ত্র চাপাইয়া বাক্যের জন্য একটা অভ্রভেদী সিংহাসন নির্মাণ করিয়া বাক্যকে মর্ত্যলোক এবং সুরলোকের মস্তকের উপর বসাইয়া দিলেন এবং পুনর্বার বজ্রনিনাদে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাক্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কে।" (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬ : ৯ম খণ্ড/৩৫২)

বাক্‌পটু পুণ্ডরীকের পাণ্ডিত্য প্রখর এবং শাস্ত্র-বিষয়েও তাঁর অগাধ জানাশোনা — এই গল্পে তার নানা নজির উপস্থাপন করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাই লক্ষ করি, পুণ্ডরীকের প্রবল শব্দঝড়ে শেখরের ভক্তিসিক্ত মৃদু উচ্চারণ সভাস্থ পণ্ডিতবৃন্দের মন থেকে মুছে গেছে। তাঁদের 'সাধ সাধু' 'ধন্য ধন্য' হর্ষধ্বনি, রাজার বিস্ময় এবং শেখরের ম্লান মুখ দিয়েই প্রথম দিনের সভা সম্পন্ন হয়।

দ্বিতীয় দিন শেখরের গান আরম্ভ হয়েছে বৃন্দাবনের বাঁশি দিয়ে। সেই বাঁশির সুর কীভাবে সবার মনে সঞ্চারিত হয়েছে এবং পুরো পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তকে তা সম্মোহিত করছে, তার চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। সুরের অপ্রতিরোধ্য অনুরণন কীভাবে সবাইকে আচ্ছন্ন করছে, তা অনুধাবনের জন্য লেখকের একটি বাক্য উদ্ধৃত করা যাক : 'কবি যখন গান শেষ করিয়া হতজ্ঞানের মতো বসিয়া পড়িলেন তখন একটি অনির্বচনীয় মাধুর্যে, একটি বৃহৎ বিরহব্যাকুলতায় সভাগৃহ পরিপূর্ণ হইয়া রহিল — কেহ সাধুবাদ দিতে

পারিল না।' (রবীন্দ্রনাথ, ২০০৬ : ৯ম খণ্ড/৩৫৩)। অর্থাৎ সাধুবাদ দেওয়ার কথা কারো মনেই রইল না। কারণ মন তখনো সেই বৃন্দাবনের বাঁশির সুরেই মগ্ন হয়ে আছে। পুণ্ডরীক রাধা-কৃষ্ণের উদ্ভব ও বিকাশের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন শেষে এই দুই নামের প্রতিটি বর্ণকে বিশেষ তাৎপর্যে তুলে ধরলেন এবং 'রাজা পুণ্ডরীকের আশ্চর্যক্ষমতায় মুগ্ধ হইয়া গেলেন, পণ্ডিতদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না এবং কৃষ্ণরাধার নব নব ব্যাখ্যায় বাঁশির গান, যমুনার কল্লোল, প্রেমের মোহ একেবারে দূর হইয়া গেল; যেন পৃথিবীর উপর হইতে কে একজন বসন্তের সবুজ রঙটুকু মুছিয়া লইয়া আগাগোড়া পবিত্র গোময় লেপন করিয়া গেল।' (রবীন্দ্রনাথ, ২০০৬ : ৯ম খণ্ড/৩৫৩)। শেখর তখন ব্যর্থতাকে নেড়েচেড়ে দেখার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

তৃতীয় দিনের লড়াইয়ের বিস্তারিত উপস্থাপন থেকে বিরত থাকা যাক। পুণ্ডরীক এখানে শব্দচাতুরীর পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন যা সভাস্থ পণ্ডিত ও সাধারণ মানুষের বিস্ময়বোধকে চরমে পৌঁছে দিয়েছে। শেষ দিনের লড়াইয়েও শেখরের অভিজ্ঞতা সুখকর নয়। পুণ্ডরীকের শব্দবাণে বিধ্বস্ত শেখর বীণাপাণির কাছে যে প্রার্থনা জানাচ্ছেন তা থেকেই তাঁর মনোভাব বোঝা যাবে : 'বীণাপাণি, শ্বেতভূজা, তুমি যদি তোমার কমলবন শূন্য করিয়া আজ মল্লভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইলে তবে তোমার চরণাসক্ত যে ভক্তগণ অমৃতপিপাসী তাহাদের কী গতি হইবে।' শেখরের জন্য আরো অপমান অপেক্ষা করছে। তাঁর নামটিও পুণ্ডরীকের কোপানল থেকে মুক্তি পায় নি। শেখর শব্দ থেকে খরকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে পুণ্ডরীক প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, পুণ্ডরীকেই সরস্বতীর অধিষ্ঠান। তাই তাঁকে খরবাহন করার জন্য তিনি রাজা উদয়নারায়ণকেও অভিযুক্ত করেন। এরপর আর শেখরের মুখে ভাষা জোটে নি। উদয়নারায়ণ শেখরের পরাজয় নিশ্চিত জেনে সিংহাসন থেকে নেমে আসেন। জয়পরাজয়ের এই দৃশ্যটি রবীন্দ্রনাথের চোখে দেখে নেওয়া যাক :

> নিজের কণ্ঠ হইতে মুক্তার মালা খুলিয়া পুণ্ডরীকের গলায় পরাইয়া দিলেন — সভাস্থ সকলেই 'ধন্য ধন্য' করিতে লাগিলেন। অন্তঃপুর হইতে এক কালে অনেকগুলি বলয় কঙ্কণ নূপুরের শব্দ শুনা গেল — তাহাই শুনিয়া শেখর আসন ছাড়িয়া উঠিলেন এবং ধীরে ধীরে সভাগৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬ : ৯ম খণ্ড/৩৫৪)

গল্পটি এখানেই শেষ হতে পারত। কিন্তু পরাজিত শেখরের ম্লান মুখ রবীন্দ্রনাথকে আরো কিছুক্ষণ ব্যস্ত রাখবে। শেখরের রক্তাক্ত হৃদয়ের গভীরতর বেদনা থেকে কীভাবে আনন্দ উৎসারিত হয়, রবীন্দ্রনাথ এবার সেই কথা শোনাবেন। 'তাঁর [রবীন্দ্রনাথ] মতে, যেহেতু আনন্দ শেষ কথা, তাই প্রেম ততোখানি সত্য যতখানি দুঃখ সে বহন করতে পারে। দুঃখ আছে, কিন্তু তার উপরে আনন্দ আছে বলে, সে আছে। আনন্দকে স্বীকার করে নিলে দুঃখকে বাদ দেওয়া যায় না।' — রবীন্দ্রসাহিত্যে দুঃখযাপনের আনন্দ সম্পর্কে ভবানীগোপাল সান্যালের (১৯৭৩ : ৩৬) এই বিবেচনা শেখরের সমর্পণকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে। একজন সৃজনশীল মানুষ পরাজয়কেও অভিনব উপায়ে উপভোগ করতে জানেন। বিষণ্ন মনে বাড়ি ফিরে শেখর সমস্ত জীবনের সৃষ্টিকর্মের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাঁর কবিপ্রতিভার অসারতা অনুধাবনের চেষ্টা করেন। জীবনের সমস্ত সঞ্চয় কেবল কথা, ছন্দ ও মিলের কারাগার– তা তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে চান না। তবুও কৃষ্ণাচতুর্দশী রাত্রির ঘন

অন্ধকারে কবিজীবনের ব্যর্থতাই তাঁকে কুরেকুরে খাচ্ছে। তাই পুথিপত্রে অগ্নিপ্রজ্বলনের মাধ্যমে তিনি কাব্যমেধযজ্ঞ সম্পন্ন করতে চাইছেন। গল্পকারের ভাষায় :

> তখন একটি একটি করিয়া তাঁহার পুঁথি ছিঁড়িয়া সম্মুখের জ্বলন্ত অগ্নিভাণ্ডে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ একটা উপহাসের কথা মনে উদয় হইল। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'বড়ো বড়ো রাজারা অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়া থাকেন — আজ আমার এ কাব্যমেধযজ্ঞ।' কিন্তু তখনি মনে উদয় হইল, তুলনাটা ঠিক হয় নাই। 'অশ্বমেধের অশ্ব যখন সর্বত্র বিজয়ী হইয়া ফিরিয়া আসে তখনি অশ্বমেধ হয় — আমার কবিত্ব যেদিন পরাজিত হইয়াছে আমি সেইদিন কাব্যমেধ করিতে বসিয়াছি — আরো বহুদিন পূর্বে করিলেই ভালো হইত।' (রবীন্দ্রনাথ, ২০০৬ : ৯ম খণ্ড/৩৫৫)

জীবনের সমস্ত সঞ্চয়কে শেখর অগ্নিশিখায় সমর্পণ করেন। যে আগুনে তিনি নিজেকে নিবেদন করছেন তা সুন্দরী অগ্নিশিখা। এই সৌন্দর্যের সঙ্গে রাজনন্দিনী অপরাজিতার কোনো সম্বন্ধ আছে কি-না তার কোনো ইঙ্গিত এই গল্পে অনুপস্থিত। তবুও সমর্পণের ভঙ্গি দেখে আমাদের ভাবতে ইচ্ছে করে, যে আগুন তাঁকে অনেক দিন ধরেই আড়াল থেকে দগ্ধ করছিল, সে-আগুনই ভিন্নতর অবয়বে কবির সৃষ্টিকর্মকে ভস্মে পরিণত করছে।

নিজের বাসগৃহকে দেবমন্দিরের আবহ দিয়েছেন শেখর। নিজের প্রিয় সব সাদা ফুলে সজ্জিত তাঁর ঘর, ঘরের চারদিকে জ্বলছে প্রদীপ, তারই মাঝখানে বসে এক অদৃশ্য দেবীর জন্য অপেক্ষা করছেন তিনি। এই দেবী তাঁর জীবনদাত্রী নন। শেখর 'মধুর সঙ্গে একটা উদ্ভিদের বিষরস মিশাইয়া নিশ্চিন্তমুখে বিষ পান করিলেন এবং ধীরে ধীরে আপনার শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন। শরীর অবশ এবং নেত্র মুদ্রিত হইয়া আসিল।' (রবীন্দ্রনাথ, ২০০৬ : ৯ম খণ্ড/৩৫৫)। যে প্রাণ এতদিন অমৃতের সন্ধানে মগ্ন ছিল, রবীন্দ্রনাথ তারই হাতে তুলে দিয়েছেন বিষের পেয়ালা। এই বিষের উৎসব শেখরহৃদয়ে অমৃতের আরাম ও আনন্দ সঞ্চারিত করবে কি-না তা দেখার জন্য আমাদের আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।

শেখরের সমর্পণ ব্যর্থ হয় নি। দেবী এসেছেন। পায়ে তাঁর নূপুর এবং কেশগুচ্ছে সুগন্ধ ফুল। শেখরের মনে তখন আনন্দের ঝড়। দেবী তাঁর আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করেন নি। মধুর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়, 'কবি, আসিয়াছি।' শেখর চোখ মেলে যে 'অপরূপ রমণীমূর্তি'কে দেখলেন তিনি আমাদের পরিচিত হলেও শেখরের সঙ্গে এই-ই তাঁর প্রথম দেখা এবং এই সাক্ষাতের মুহূর্তটিকেও রবীন্দ্রনাথ আবছা অন্ধকারে ঢেকে দিয়েছেন। এ-কারণেই শেখরের কাছে অপরাজিতাকে পরিচয়পত্র মেলে ধরতে হয়। হাতে খুব বেশি সময় নেই। তাই কয়েকটি বাক্যেই এই নারীকে তাঁর অভিপ্রায় উপস্থাপন করতে হয় :

> রমণী কহিলেন, "আমি রাজকন্যা অপরাজিতা।"
> কবি প্রাণপণে উঠিয়া বসিলেন।
> রাজকন্যা কহিলেন, "রাজা তোমার প্রতি সুবিচার করেন নাই। তোমারই জয় হইয়াছে, কবি, তাই আমি আজ তোমাকে জয়মাল্য দিতে আসিয়াছি।
> বলিয়া অপরাজিতা নিজের কণ্ঠ হইতে স্বহস্তরচিত পুষ্পমালা খুলিয়া কবির গলায় পরাইয়া দিলেন। মরণাহত কবি শয্যার উপরে পড়িয়া গেলেন। (রবীন্দ্রনাথ, ২০০৬ : ৯ম খণ্ড/৩৫৫)

এভাবেই 'জয়পরাজয়ে'র শেষরেখা টেনেছেন রবীন্দ্রনাথ। গীতবাণীতে তিনি সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করেছেন, যেন মরণ হতে গানের সুরে জেগে উঠতে পারেন। কবির স্নেহসিক্ত শেখরের সেই অভিপ্রায় প্রবল কি-না এই গল্পে তার কোনো সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নেই। কিন্তু তাঁর এই প্রস্থান পাঠকের মনে সুরের আগুন লাগিয়ে দেয় এবং সে আগুন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে চায়।

রবীন্দ্রনাথ শিল্পসাহিত্যের বিচারের ভার রাজার হাতে অর্পণ করে স্বস্তি পান নি। তাই তাঁকে রাজকন্যার শরণ নিতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বিবেচনায় এই রাজকন্যা সাহিত্যের আদর্শ পাঠক, যদিও এই গল্পে তাঁকে পাঠক নয়, বরং শ্রোতা হিসেবেই উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। পাঠককে সাহিত্যের বিচারক হিসেবে দেখতে চান নি রবীন্দ্রনাথ। শিল্পসাহিত্যের যিনি যথার্থ বোদ্ধা, তিনি কোনো প্রলোভন কিংবা পক্ষপাতকেই প্রশ্রয় দেন না। তিনি সত্যের মতোই কঠোর-কঠিন-নির্মম, কিন্তু সুন্দর এবং শেষ পর্যন্ত অপরাজিত। রবীন্দ্রনাথ বোধকরি এজন্যই তাঁর পছন্দের পাঠক বা শ্রোতার নাম রেখেছেন অপরাজিতা। আবার গল্পের প্রথম থেকেই এই অপরাজিতাকে শেখরের মানসপ্রতিমা হিসেবে দেখা যায়। শেখর ও অপরাজিতার যে বন্ধন তা হয়ত অদৃশ্য ছিল, কিন্তু সে বন্ধন যে অচ্ছেদ্য সে বিষয়ে পাঠকের সন্দেহ জন্মে না। দুজনের এই বন্ধনকে জীবন ও শিল্পের সুদৃঢ় সম্পর্কের স্মারক হিসেবে দেখা যেতে পারে।

চার

রবীন্দ্রনাথের *সোনার তরী* কাব্যের 'পুরস্কার' শীর্ষক দীর্ঘ কবিতায়ও কবির সঙ্গে একজন রাজার কথোপকথন লক্ষ করা যায়। এই কবিতায় রাজাকে খুশি করে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার বিচিত্র আয়োজনে বিপুলসংখ্যক লোকের অংশগ্রহণের গল্প শুনিয়েছেন কবি। টানাটানির সংসারে কবির সংসারবিমুখ কর্মকাণ্ডে বিপর্যস্ত স্ত্রীর মনেও ইচ্ছে জাগে, রাজদরবারে গিয়ে রাজাকে খুশি করে তার কবিপুরুষ সুন্দর ও সুখকর জীবনযাপনের জন্য অত্যাবশ্যক অর্থের ব্যবস্থা করবে। রাজদরবারে গিয়ে কবি দেখেন, রাজাকে নানা ভাবে ও ভঙ্গিতে পরিতৃপ্ত করে সবাই যে-যার ইচ্ছে পূরণে ব্যস্ত। কবির পরিচয় যখন জানতে চাওয়া হলো, তখন —

> কবি কী করিবে ভাবে মনে মনে,
> রাজা দেখে তারে সভাগৃহকোণে
> বিপন্নমুখচ্ছবি।
> কবি কহি উঠে, 'আমি কেহ নই,
> আমি শুধু এক কবি।
> রাজা কহে, 'বটে! এসো এসো তবে,
> আজিকে কাব্য-আলোচনা হবে।' (রবীন্দ্রনাথ, ২০০৬ : ২য় খণ্ড/৯৬)

এই কবিতায় লক্ষ করা যাবে, কাব্যালোচনায় কবির দক্ষতা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সময়-সমাজ-সংসার সম্পর্কে কবির অভিব্যক্তিও রাজাকে মুগ্ধ করেছে। একজন কবির করণীয় বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত বক্তব্যে রাজা অভিভূত এবং কবি কী পরিতোষ প্রত্যাশা করেন তা

জানতে চান। রাজা যখন রাজভাণ্ডারের সবকিছু বিলিয়ে দিতেও প্রস্তুত, কবি তখন এক আশ্চর্য অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় :

> ভাবিয়া না পাই কী দিব তোমারে,
> করি পরিতোষ কোন্ উপহারে,
> যাহা-কিছু আছে রাজভাণ্ডারে
> সব দিতে পারি আনি।'
> প্রেমোচ্ছ্বসিত আনন্দ-জলে
> ভরি দু নয়ন কবি তাঁরে বলে,
> 'কণ্ঠ হইতে দেহো মোর গলে
> ওই ফুলমালাখানি।' (রবীন্দ্রনাথ, ২০০৬ : ২য় খণ্ড/৯৭)

কবির এই বিষয়বুদ্ধিহীন সিদ্ধান্তে কবিপত্নীর ক্ষুব্ধ হওয়ারই কথা। কবি যখন জানান, 'নানা লোকে নানা পেয়েছে রতন/আমি আনিয়াছি করিয়া যতন/তোমার কণ্ঠে দেবার মতন/রাজকণ্ঠের মালা।', তখন কবিপত্নী রাগের ভান করলে কবি ভয় পেয়ে তার মন ভোলানোর চেষ্টা করেন। ভান করে কবিকে বেশিক্ষণ কষ্ট দেয় না সে। উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠে সে কবির বুকে ঢলে পড়ে তাঁকে চুম্বনে সিক্ত করে দেয়, যার অর্থ এই যে, রাজসভায় অজস্র মানুষের মধ্যে একমাত্র কবিই সবচেয়ে মূল্যবান উপহারটি তার জন্য ঘরে নিয়ে এসেছেন। কবিতাটি দীর্ঘ হলেও এর আয়োজনে অভিনবত্ব থাকায় পাঠকচৈতন্যে আরামদায়ক আবহ সঞ্চারিত হয়। অনায়াসেই এই কবিতায় বিধৃত রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায়টি অনুধাবন করা যায়। 'পুরস্কার' এবং 'জয়পরাজয়ে'র ফুলের মালার তাৎপর্য নিশ্চয়ই সমান নয়, কিন্তু দুই মালাই কবির বিজয়কেতন হিসেবে বিভাসিত।

চিত্রা কাব্যের 'আবেদন' শীর্ষক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ভৃত্য ও রানীর কথোপকথনের মাধ্যমে সমর্পণ ও সৃষ্টির আন্তঃসম্পর্কের স্বরূপ উন্মোচনের প্রয়াস পেয়েছেন। রানীর আশীর্বাদসিক্ত হয়ে তাঁর নির্দেশমতো সভাসদবৃন্দ জয়শঙ্খ বাজিয়ে যে যার কাজে চলে গেছে। সবার শেষে ভৃত্য এসে তার প্রার্থনা জানায়। রানী বুঝতে পারেন না অসময়ে তিনি কীভাবে কী দিয়ে ভৃত্যকে পরিতৃপ্ত করবেন। রানীর কাছে ভৃত্য তার অভিপ্রায় জানাচ্ছে এইভাবে :

> হাসি মুখ
> দেখে চলে যাব। আছে দেবী, আরো আছে—
> নানা কর্ম নানা পদ নিল তোর কাছে
> নানা জনে; এক কর্ম কেহ চাহে নাই,
> ভৃত্য-'পরে দয়া করে দেহো মোরে তাই—
> আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর। (রবীন্দ্রনাথ, ২০০৬ : ২য় খণ্ড/১৮১)

ভৃত্যের এই অভিপ্রায়ে রানী বিস্মিত। রাজ্যের শোভা ও সমৃদ্ধির সবকিছু সম্পর্কেই কবি অবগত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের স্বর্গ যেন এই রাজ্য। কত কাজই তো আছে করার মতো, যাতে সম্মান, প্রতিপত্তি ও বিত্তলাভের সুযোগ বিদ্যমান। কিন্তু 'কর্মভীরু অলস কিংকর' সেসব কাজে আগ্রহ দেখায় না। রানীর মালঞ্চের মালাকরই তার প্রার্থিত পদ। সে কোনো

কাজেই লাগতে চায় না। অকাজের কাজ যত তা দিয়েই সে রানীকে পরিতৃপ্ত করতে চায়। এই মালাকর-অনুষঙ্গকে বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রসাহিত্যের একটি সাধারণ কুললক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন, "আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর!' এই ঘোষণা ক্ষণিক নয়, আকস্মিক নয়, তাঁর সমগ্র রচনার মধ্যে ধ্রুবপদের মতো ধ্বনিত।" (বুদ্ধদেব, ১৯৯১ : ২০৩)। প্রসঙ্গত *সোনার তরীর* 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' এবং *চিত্রার* 'অন্তর্যামী' ও 'জীবনদেবতা' কবিতার কথাও উল্লেখ করেছেন বুদ্ধদেব, যেখানে কবির মানসসুন্দরী কখনো মানবী আবার কখনো দেবীর অবয়বে রবীন্দ্রনাথকে সৃষ্টিকর্মে নিমগ্ন রেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ 'আবেদন' কবিতায় ভৃত্যের মুখে যে ভাষা দিয়েছেন, তার সঙ্গে লেখকের সাহিত্যভাবনার একটা দূরস্থিত সম্পর্ক নির্মাণ করা সম্ভব :

অকাজের কাজ যত,
আলস্যের সহস্র সঞ্চয়। শত শত
আনন্দের আয়োজন। যে অরণ্যপথে
কর তুমি সঞ্চরণ বসন্তে শরতে
প্রত্যুষে অরুণোদয়ে, শ্লথ অঙ্গ হতে
তপ্ত নিদ্রালসখানি স্নিগ্ধ বায়ুস্রোতে
করি দিয়া বিসর্জন, সে বনবীথিকা
রাখিব নবীন করি।... (রবীন্দ্রনাথ, ২০০৬ : ২য় খণ্ড/১৮২)

ভৃত্যের কর্মযজ্ঞের যে পরিচয় দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, তার সঙ্গে একজন সাহিত্যস্রষ্টার অভিপ্রায়ের অন্বয় সচেতন পাঠকের দৃষ্টি এড়ানোর কথা নয়। মালাকর হিসেবে ভৃত্যের দৃষ্টি যে সকল বিষয় ও কর্মে আকৃষ্ট হয়েছে, তা তার সৃজনপ্রতিভার স্মারক হিসেবে অসাধারণ। মালাকরের করস্পর্শে বাগানের ফুল যেমন নিজেকে উন্মোচিত করে, তেমনি কবির সৃজনকর্মের সান্নিধ্যে পাঠকহৃদয় প্রসারিত ও পল্লবিত হয়। দৈনন্দিন প্রয়োজন থেকে মুক্তি দিয়ে শিল্পসাহিত্য আমাদের চৈতন্যে ছড়িয়ে দেয় অনাস্বাদিত আনন্দ। 'নব ভাবে নব রূপে শুভ-আলিম্পনে/প্রত্যহ রাখিব অঙ্কি কুঙ্কুমে চন্দনে/কল্পনার লেখা'— ঠিক এই কাজই তো করেন একজন প্রতিভাবান শিল্পস্রষ্টা। গদ্যভাষ্যে নির্মিত রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যভাবনার সঙ্গে উপরিউক্ত কাব্যাংশের সাযুজ্য লক্ষ করা যাক :

> সাহিত্যের যথার্থ বাজে রচনাগুলি কোনো বিশেষ কথা বলিবার স্পর্ধা রাখে না। সংস্কৃত সাহিত্যে মেঘদূত তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাহা ধর্মের কথা নহে, কর্মের কথা নহে, পুরাণ নহে, ইতিহাস নহে। যে অবস্থায় মানুষের চেতন-অবচেতনের বিচার লোপ পাইয়া যায় ইহা সেই অবস্থার প্রলাপ। ইহাকে যদি কেহ বদরীফল মনে করিয়া পেট ভরাইবার আশ্বাসে তুলিয়া লন তবে তখনি ফেলিয়া দিবেন। ইহাতে প্রয়োজনের কথা কিছুই নাই। ইহা নিটোল মুক্তা, এবং ইহাতে বিরহীর বিদীর্ণ হৃদয়ের রক্তচিহ্ন কিছু লাগিয়াছে, কিন্তু সেটুকু মুছিয়া ফেলিলেও ইহার মূল্য কমিবে না। (রবীন্দ্রনাথ, ২০০৬ : ৩য় খণ্ড/৭৫২)

রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে বোঝাতে চেয়েছেন, কালোত্তীর্ণ সাহিত্যে 'বাজে কথা'র রসাত্মক ও ব্যক্তিত্বচিহ্নিত বুননই প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয় যা কেজো কথার আবর্জনাকে আঁস্তাকুড়ে ঠেলে দিয়ে বিশ্বসাহিত্যের আসরে জায়গা করে নেয়। তিনি বিশ্বাস করেন, সাহিত্যক্ষেত্রে

অপ্রয়োজনীয় অনুষঙ্গই চিরস্থায়ী আভিজাত্যে প্রোজ্জ্বল-প্রদীপ্ত। 'আবেদন' কবিতায় ভৃত্য সেই বাজে কাজের একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চেয়েছে। ভৃত্যের এই অভিপ্রায়ের অমর্যাদা করেন নি রানী, 'রাজসভা-বহিঃপ্রান্তে' ঘর নির্মাণের অনুমতি মিলেছে কবির। 'বহু মন্ত্রী/বহু সৈন্য, বহু সেনাপতি — যহু যন্ত্রী/কর্মযন্ত্রে রত', কিন্তু এইসব গুরুত্বপূর্ণ কাজের চেয়েও একটি মহত্তম কাজের যোগ্য লোকটিই যে এই ভৃত্য, তা বুঝতে পেরেই এই তথাকথিত 'খ্যাতিহীন কর্মহীন' ভৃত্যকে মালঞ্চের মালাকর হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন রানী। 'জয়পরাজয়ে'র শেখরও প্রবল ভক্তিভরে উদয়নারায়ণের অভিপ্রায় অনুযায়ী মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। রাজার প্রতি প্রণত দৃষ্টি মেলে অন্তর্গত অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন তিনি, 'আমি তোমারই। তুমি যদি বিশ্বসমক্ষে আমাকে দাঁড় করাইয়া পরীক্ষা করিতে চাও তো করো। কিন্তু—'। একটি অসম্পূর্ণ বাক্যের গভীরে শেখরের যে বেদনা ধরা পড়েছে, উদয়নারায়ণের তা না বোঝার কথা নয়। শেখরের দীর্ঘশ্বাস অন্তরালবর্তী রাজনন্দিনীর অন্তরকে বিক্ষত করেছিল কি-না, তা রবীন্দ্রনাথও দৃষ্টির অগোচরে রেখে দিয়েছেন।

'জয়পরাজয়ে'র দিগ্‌বিজয়ী কবি পুণ্ডরীকের দৃষ্টি ছিল উদয়নারায়ণের মুক্তার মালার দিকে এবং অপূর্ব চাতুর্য ও কৌশলে সিদ্ধহস্ত এই কবি তা করায়ত্তও করেছেন। বৈভবের প্রলোভনজাত যে বীরত্ব তা স্বাস্থ্যকর নয় বলেই মনে করেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি লিখেছেন, 'রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে মানুষ আপন পূর্ণতাকে উৎসর্গ করে দিয়েই পূর্ণতার ঐশ্বর্য লাভ করে।... সেই সৃষ্টির মূল্য কেবল জীবনযাত্রার উপযোগিতায় নয়, মানবাত্মার পূর্ণস্বরূপের বিকাশে — তা অহৈতুক, তা আপনাতে আপনি পর্যাপ্ত।' (২০০৬ : ১২শ খণ্ড/৪৭২)। পুণ্ডরীক পূর্ণস্বরূপের বিকাশ-প্রয়াসী নয়, তাঁর সৃষ্টিকর্মের মধ্যে আত্মবিসর্জনের কোনো চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যাবে না। কেবল 'উপকরণসংগ্রহে'ই ব্যস্ত তিনি, যা তাঁর পার্থিব প্রাপ্তির প্রত্যাশাকেই তীব্রতর করেছে। একইভাবে ভঙ্গি দিয়ে পাঠকের মন ভোলানোর কাজটিও যে কবির পক্ষে সম্মানজনক নয়, সেই সংবাদও তিনি *জন্মদিনে* কাব্যে পাঠককে জানিয়ে দিয়েছেন :

> সাহিত্যের আনন্দের ভোজে
> নিজে যা পারি না দিতে নিত্য আমি থাকি তারি খোঁজে।
> সেটা সত্য হোক,
> শুধু ভঙ্গি দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ।
> সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি
> ভালো নয়, ভালো নয়, নকল সে শৌখিন মজ্‌দুরি।
> (রবীন্দ্রনাথ, ২০০৬ : ১৩শ খণ্ড/৭০)

রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, নকল ও শৌখিন মজ্‌দুরিই পুণ্ডরীক-প্রতিভার প্রধান অবলম্বন। পাণ্ডিত্যের ধারালো আঘাতে রাজা, পণ্ডিত ও সাধারণ পাঠক-শ্রোতাকে সচকিত করার শক্তি অর্জন করেছেন তিনি, কিন্তু প্রাণের কাছে তাঁর আবেদন কোনো অর্থবহ অনুরণন সঞ্চার করে না। স্বার্থসিদ্ধির জন্য যা রচিত হয়, তা সাহিত্যপদবাচ্য নয় বলেই মনে করেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর মতে, 'সাহিত্য জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ, তাহা তো প্রয়োজনের প্রকাশ

নয়।' (রবীন্দ্রনাথ, ২০০৬ : ১২শ খণ্ড/৫৮১)। সাহিত্যে আমরা যে রসের সন্ধান করি, তাও আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনের সীমানা অতিক্রমণের শক্তি সরবরাহ করে। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন :

> যে রস মানবের সর্বপ্রকার প্রয়োজনমাত্রকে অতিক্রম করিয়া বাহিরের দিকে ধাবিত হয় তাহাই সাহিত্যরস। এইরূপ, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদকেই আমরা ঐশ্বর্য বলিয়া থাকি। সাহিত্য মানবহৃদয়ের ঐশ্বর্য। ঐশ্বর্যেই সকল মানুষ সম্মিলিত হয়; যাহা অতিরিক্ত তাহাই সর্বসাধারণের। (রবীন্দ্রনাথ, ২০০৬ : ৪র্থ খণ্ড/৭৫৪)

পুণ্ডরীক মানবহৃদয়কে উপেক্ষা করে কেবল ঐশ্বর্যের দিকেই দৃষ্টি প্রসারিত রেখেছেন। তাঁর সমস্ত প্রয়াসই প্রয়োজনকে অবলম্বন করে আবর্তিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ পুণ্ডরীকের চাতুর্যের যে পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন, তার একটি নমুনা উপস্থাপন করা যাক :

> পরদিন পুণ্ডরীক ব্যস্ত এবং সমস্ত, দ্বিব্যস্ত এবং দ্বিমস্তক, বৃত্ত, তার্ক্ষ্য, সৌত্র, চক্র, পদ্ম, কাকপদ, আদ্যুত্তর, মধ্যোত্তর, অন্তোত্তর, বাক্যোত্তর, শ্লোকোত্তর, বচনগুপ্ত, মাত্রাচ্যুতক, চ্যুতদত্তাক্ষর, অর্থগূঢ়, স্তুতিনিন্দা, অপহ্নুতি, শুদ্ধাপভ্রংশ, শাব্দী, কালসার, প্রহেলিকা প্রভৃতি অদ্ভুত শব্দচাতুরী দেখাইয়া দিলেন। শুনিয়া সভাশুদ্ধ লোক বিস্ময় রাখিতে স্থান পাইল না। (রবীন্দ্রনাথ, ২০০৬ : ৯ম খণ্ড/৩৫৩)

উপরিউক্ত তালিকায় বিস্মিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক এবং সংগত, কিন্তু এই বিস্ময় পাঠক-শ্রোতার অন্তরে কোনো সুখকর প্রণোদনা সঞ্চার করে না। এই বিস্ময় অপরিচয়ের আবহ থেকে উৎসারিত, অন্তরের সঙ্গে সংযোগসাধনের শক্তি তাতে অনুপস্থিত। পুণ্ডরীকের চাপল্য ও চাতুর্যে জ্ঞানের প্রভাব পরিদৃষ্ট হলেও তাতে ভাবের ঘাটতি প্রবল। তাই তাঁর শব্দাড়ম্বর হৃদয়কে কেবল নাড়া দিয়ে যায়, হৃদয়ের সাড়া মেলে না কিছুতেই। 'অন্তরের জিনিসকে বাহিরের, ভাবের জিনিসকে ভাষার, নিজের জিনিসকে বিশ্বমানবের এবং ক্ষণকালের জিনিসকে চিরকালের করিয়া তোলা সাহিত্যের কাজ।'— রবীন্দ্রনাথের (২০০৬ : ৪র্থ খণ্ড/৬৫৪) এই অভিব্যক্তি পুণ্ডরীকের কর্মকাণ্ড থেকে দূরবর্তী বলেই তা রাজশক্তির আনুকূল্য লাভে সমর্থ হলেও তাঁর জন্য হৃদয়ের প্রবেশপথ অবরুদ্ধই থেকে গেছে।

*শেষের কবিতা*র অমিত রায় বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রনাথের একাধিপত্য বিলুপ্তির প্রস্তাব নিয়ে একজন নিবারণ চক্রবর্তীর জন্ম দিয়েছিলেন। লাবণ্যের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের গতিবিধি কেবল কাব্যিক নয়, নাটকীয়ও বটে। কিন্তু এই সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত পাঠকের প্রত্যাশিত গন্তব্যে পৌঁছায় নি। নিবারণ চক্রবর্তীও একদিন তাঁর মুখোশ থেকে মুক্ত হয়ে 'অতি সৌখিন জলচর মাছের মতো' মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছেন। তাই অমিত রায় লাবণ্যের উদ্দেশে শেষ লেখাটির ভার দিয়েছিলেন লাবণ্যের কবি অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথেরই ওপর। এভাবেই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের বিরুদ্ধে অমিতের উত্থাপিত অভিযোগসমূহ ব্যর্থ হয়ে গেছে। পুরনো বন্দরে নোঙর করে অমিত কেটির নাম বদলে আবার কেতকীতে ফিরে এসেছেন, সেই নামের মাধুরি বৃদ্ধি করে "অমিত তাকে নাকি 'কেয়া' বলে। এ কথাও লোকে কানাকানি করছে যে, নৈনিতালের সরোবরে নৌকো ভাসিয়ে কেটি তার হাল ধরেছে আর অমিত তাকে পড়ে শোনাচ্ছে রবি ঠাকুরের 'নিরুদ্দেশ যাত্রা।" (রবীন্দ্রনাথ, ২০০৬ :

৫ম খণ্ড/৫৫৯-৬০)। লাবণ্যের বাবার একনিষ্ঠ ছাত্র শোভনলালের উপস্থিতি এ-উপন্যাসে উল্লেখ করার মতো নয়। লাবণ্য বলছেন, 'একটি ছেলে ছিল, সে আমার বাবাকে গুরু বলে ভক্তি করত। বাবা দিয়েছিলেন তাকে তার জ্ঞানের খাদ্য, এদিকে তার হৃদয়টিও ছিল তাপস। সময় পেলেই সে যেত রবি ঠাকুরের কাছে, তাঁর খাতা থেকে মুষ্টিভিক্ষা করে আনত।' (রবীন্দ্রনাথ, ২০০৬ : ৫ম খণ্ড/৫৩৮)। এই শোভনলাল রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে মুষ্টিভিক্ষা করে এনে কোথাও রেখে দিত যাতে লাবণ্যের দৃষ্টিতে পড়ে এবং সে তা তুলে নেয়। পাঠকের মনে থাকার কথা, এই শোভনলালের একটি চিঠিতেই লাবণ্য খুঁজে নিয়েছেন তাঁর শেষ ঠিকানা। শোভনলালের সঙ্গে লাবণ্যের বিবাহের সংবাদের জন্য পাঠকের প্রস্তুতি ছিল না। তবু তাই ঘটেছে। এ-কেবল *শেষের কবিতা* উপন্যাসের জন্যই সত্য নয়, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যভাবনা অনুধাবনেরও এ-এক অনবদ্য কৌশলপত্র বলে মনে হয়। অমিত রায় যেখানে ঝড়ের বেগে লাবণ্যকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, সেখানে শোভনলালের আগমন ঘটেছে অনেকটা সময়ের মতো নিঃশব্দে; স্বপ্নের হাত ধরে মানুষের সম্ভাবনা যে-রকম উজ্জ্বল আগামীকে স্পর্শ করতে চায় — ঠিক সেইভাবে। একদিক থেকে শোভনলালেরই জয় হয়েছে। 'জয়পরাজয়' গল্পের পুণ্ডরীক পাঠককে অমিত রায়ের কথা মনে করিয়ে দেয় আর শেখরের শর্তহীন সমর্পণের আড়ালে দেখা যায় 'অপমানিত শোভনলালের সেই কুণ্ঠিত ব্যথিত মূর্তি', যিনি শেষ পর্যন্ত রূপে নয়, পাণ্ডিত্যেও নয়, ভালোবাসা দিয়েই লাবণ্যকে জয় করে নিয়েছেন।

পাঁচ

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের উৎস অনুসন্ধানে অবতীর্ণ হয়ে সহিত শব্দের শরণ নিয়েছেন, যা পাঠকচৈতন্যে মিলনের ভাব সঞ্চার করে। এই মিলনকে তিনি কেবল ভাব ও ভাষার সম্মিলনে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তাঁর মতে, 'মানুষের সহিত মানুষের, অতীতের সহিত বর্তমানের, দূরের সহিত নিকটের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ যোগসাধন সাহিত্য ব্যতীত আর-কিছুর দ্বারাই সম্ভবপর নহে।' (রবীন্দ্রনাথ, ২০০৬ : ৪র্থ খণ্ড/৬৯৭)। 'জয়পরাজয়' গল্পের শেখরকে তাঁর স্রষ্টা সেই 'অন্তরঙ্গ যোগসাধনে'র মন্ত্র শিখিয়ে দিয়েছেন। *পঞ্চভূত* গ্রন্থে সমীরের মুখ দিয়ে লেখক জানিয়েছেন :

> যেগুলি জীবনের অলঙ্কার, যাহা কমনীয়তা, যাহা কাব্য, সেইগুলিই মানুষের মধ্যে যথার্থ বন্ধন স্থাপন করে, পরস্পরের পথের কন্টক দূর করে, পরস্পরের হৃদয়ের ক্ষত আরোগ্য করে, নয়নের দৃষ্টি খুলিয়া দেয়, এবং জীবনের প্রসার মর্ত হইতে স্বর্গ পর্যন্ত বিস্তারিত করে।' (রবীন্দ্রনাথ, ২০০৬ : ১ম খণ্ড/৯১৪)।

এই বক্তব্যে রবীন্দ্রনাথের শিল্পভাবনারই প্রতিবিম্ব ধরা পড়েছে। শেখরের কবিতা ও গানকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়াস দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। শেখরের গানকে বৃন্দাবনের বাঁশির রূপকল্পে উপস্থাপন করেছেন লেখক। সেই বাঁশি কখনো দক্ষিণের আবাহন রচনা করেছে, আবার কখনো-বা 'উত্তরের গিরিবর্ধনের শিখর' স্পর্শের আবহ সঞ্চার করেছে। শেখরের গান উদয়াচলের আনন্দ এবং অস্তাচলের বেদনাকে একই বৃন্তে ধারণ করতে চায় :

মনে হইল, আকাশের প্রত্যেক তারা যেন সেই বাঁশির ছিদ্র — অবশেষে কুঞ্জে কুঞ্জে, পথে ঘাটে, ফুলে ফলে, জলে স্থলে, উচ্চে নীচে, অন্তরে বাহিরে বাঁশি সর্বত্র হইতে বাজিতে লাগিল — বাঁশি কী বলিতেছে তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না এবং বাঁশির উত্তরে হৃদয় কী বলিতে চাহে, তাহাও কেহ স্থির করিতে পারিল না; কেবল দুটি চক্ষু ভরিয়া অশ্রুজল জাগিয়া উঠিল এবং একটি অলোকসুন্দর শ্যামস্নিগ্ধ মরণের আকাঙ্ক্ষায় সমস্ত প্রাণ যেন উচ্চকিত হইয়া উঠিল।' (রবীন্দ্রনাথ, ২০০৬ : ৯ম খণ্ড/৩৫২)

এভাবেই রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, শেখরের কবিতা-গান কীভাবে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, গড়িয়ে যায়, এবং যেতে যেতে সবাইকে জড়িয়েও ধরতে চায়। এই জড়িয়ে ধরার অভিব্যক্তিকেই রবীন্দ্রনাথ কালোত্তীর্ণ সাহিত্যের কুললক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন।

শেখরের সহজ-সরল-স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের আড়ালে মানুষের চিরন্তন অনুভব ও অভিব্যক্তি অর্জন করে নিয়েছে প্রোজ্জ্বল শিল্পসংহতি। প্রাণের সঙ্গে প্রাণের বন্ধনেই তাঁর কবিতা ও গান সেকাল-একালের ব্যবধান মুছে দেয়। 'আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ সুরের বাঁধনে—/তুমি জানো না, আমি তোমারে পেয়েছি অজানা সাধনে ॥'— রবীন্দ্রনাথের (১৯৭০ : ২য় খণ্ড/৩৫৯) এই গীতবাণীতে যে বন্ধনের কথা ব্যক্ত হয়েছে, তা কেবল প্রেমেরই মূলমন্ত্র নয়, তা শিল্পসাহিত্য অনুধাবনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে। শেখর সেই প্রাণের সঙ্গে প্রাণের মিলনগাথা রচনা করেছেন বলেই তাঁর আবেদন বৃন্দাবনের বাঁশির সুরের মতোই পাঠক-শ্রোতার চৈতন্যে অনবরত আবর্তিত হতে থাকে।

ছয়

রবীন্দ্রনাথের গীতবাণী থেকে এক ঝলক রোদ্দুর ধার করে এই নিবন্ধের নামফলকে আলোক-সঞ্চারের চেষ্টা করা হয়েছে। 'তোমায় কিছু দেব ব'লে চায় যে আমার মন,/নাই-বা তোমার থাকল প্রয়োজন।' — রবীন্দ্রনাথ (১৯৭১ : ১ম খণ্ড/৩০) এই গীতবাণীতে ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের গতিবিধি বিষয়ক একটা ধারণাপত্র উপস্থাপন করেছেন বলে মনে হয়। বিজন বনের গভীর অন্ধকারে পরম প্রভুর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন তিনি। ঈশ্বর অন্ধকারেও অবাধে চলাফেরা করতে পারেন, তবু তাঁর পথে আলো ধরার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন কবি। হাটের লোকের অপমান-গালাগাল-ধুলাবালি ঈশ্বরকে বিচলিত করতে পারে না। 'আপন-সুরে-আপনি-নিমগন' তাঁর বীণা বেজেই চলে। ভক্তের বরণমালা, কিংবা পায়ে লুটিয়ে পড়ে মুগ্ধ পূজারির আত্মনিবেদন — এসবের হয়ত কোনো প্রয়োজনই অনুভব করেন না স্রষ্টা। তবুও সমর্পণের বিচিত্র আয়োজনে প্রাণবন্ত আমাদের পৃথিবী। এবং পরম প্রভুর বীণা থেকে অনবরত ঝরতেই থাকে সুরের বৃষ্টি। স্রষ্টা ও সৃষ্টির এই আন্তঃসম্পর্কের সাংগীতিক উপস্থাপনার সমান্তরালে প্রতিস্থাপিত হতে পারে শেখর ও অপরাজিতা। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয় হচ্ছে মানুষ সৃষ্টিকর্তা।' (২০০৬ : ১২শ খণ্ড/৪৭০)। পৃথিবীর সঙ্গে গভীর সম্পর্কে ঋদ্ধ এই সৃষ্টিকর্তার আত্মার আনন্দ থেকেই তিনি স্বর্গলোক উদ্ভাবনের কথা বলেছেন, যাকে 'লক্ষপতির কোষাগার' কিংবা 'পৃথ্বিপতির জয়স্তম্ভ' বিচলিত করে না। তিনি শিল্পস্রষ্টাকে লোভ ও দম্ভের বাইরে রাখতে চান। তাঁর মতে, মানুষ ব্যবসায়িক প্রয়োজনে নির্মাণ করে, আর সৃষ্টির মধ্যে সুপ্ত থাকে আত্মার

অনুপ্রেরণা। 'জয়পরাজয়ে'র শেখরের কাছেও তো লোভ ও দম্ভ পরাস্ত হয়েছে। তাই তিনি নির্মাতা নন, স্রষ্টা। পরম প্রভুর উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথের নিবেদন : 'আমার বাঁশি তোমার হাতে ফুটোর পরে ফুটো তাতে—/তাই শুনি সুর এমন মধুর পরান-ভরানো ॥' (১৯৭১ : ১ম খণ্ড/২২৪)। শেখরের হাতের বীণায় তো আমরা তাঁর স্রষ্টার অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের এই অভিপ্রায়ই মূর্ত হতে দেখি।

গ্রন্থপঞ্জি

অশ্রুকুমার শিকদার (১৯৮১)। *বাক্যের সৃষ্টি : রবীন্দ্রনাথ*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

প্রমথনাথ বিশী (১৩৬১)। *রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প*। মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা।

বুদ্ধদেব বসু (১৯৫৯)। *রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য*। নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা।

(১৯৯১)। *সঙ্গ : নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ*। এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা. লি., তৃতীয় মুদ্রণ, কলকাতা।

ভবানীগোপাল সান্যাল (১৯৭৩)। *রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যের পথে*। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা।

রথীন্দ্রনাথ রায় (১৯৫৯)। *ছোটগল্পের কথা*। পুস্তক বিপণী, কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৭০)। *গীতবিতান*। দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৭১)। *গীতবিতান*। প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০০৬)। পঞ্চভূত। *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, ঐতিহ্য তৃতীয় সংস্করণ পুনর্মুদ্রণ, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০০৬)। চিত্রা। *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ২য় খণ্ড, ঐতিহ্য তৃতীয় সংস্করণ পুনর্মুদ্রণ, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০০৬)। সোনার তরী। *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ২য় খণ্ড, ঐতিহ্য তৃতীয় সংস্করণ পুনর্মুদ্রণ, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০০৬)। বিচিত্র প্রবন্ধ। *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ৩য় খণ্ড, ঐতিহ্য তৃতীয় সংস্করণ পুনর্মুদ্রণ, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০০৬)। সাহিত্য। *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ৪র্থ খণ্ড, ঐতিহ্য তৃতীয় সংস্করণ পুনর্মুদ্রণ, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০০৬)। শেষের কবিতা। *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ৫ম খণ্ড, ঐতিহ্য তৃতীয় সংস্করণ পুনর্মুদ্রণ, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০০৬)। সাহিত্যের পথে। *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ৯ম খণ্ড, ঐতিহ্য তৃতীয় সংস্করণ পুনর্মুদ্রণ, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০০৬)। গল্পগুচ্ছ। *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ৯ম খণ্ড, ঐতিহ্য তৃতীয় সংস্করণ পুনর্মুদ্রণ, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০০৬)। জন্মদিনে। *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ১৩শ খণ্ড, ঐতিহ্য তৃতীয় সংস্করণ পুনর্মুদ্রণ, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০০৬)। সাহিত্য। *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ১৭শ খণ্ড, ঐতিহ্য তৃতীয় সংস্করণ পুনর্মুদ্রণ, ঢাকা।

সত্যেন্দ্রনাথ রায় (১৯৯০)। *সাহিত্যতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯৯৫)। *সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধসংগ্রহ*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৪০৪)। *রবীন্দ্রনাথ*। তৃতীয় সংস্করণ, এ. মুখার্জী এ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

সুমিতা চক্রবর্তী (২০১০)। *আমার রবীন্দ্রনাথ : গ্রহণে বর্জনে*। রত্নাবলী, কলকাতা।